বিসমিল্লাহ

ইতিহাসের আঁকেবাঁকে—১

ইতিহাস কেন পড়ব?

আমাদের ইতিহাস কি বিকৃত?

আমরা কি ইসলামী ইতিহাসের ওপর আস্থা রাখতে পারি?

প্রথম পর্বে আমরা উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব। ইন শাআল্লাহ।

আমরা ইতিহাসটাকে একটু গভীরে গিয়ে চর্চা করতে চাই। যাতে করে আমাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি হয়, আস্থা সৃষ্টি হয়। আমরাও পারি, এমন অনুভূতি সৃষ্টি হয়। উম্মাহর অনেক সদস্যের মধ্যেই এই চিন্তা কাজ করে, আমরা এক অন্তহীন অন্ধকার গলিতে ঢুকে পড়েছি। আমরা আর কখনো এই দুর্বিপাক থেকে বের হতে পারব না। আমাদের চিন্তা ও কর্মে স্থবিরতা, জড়তা তৈরি হয়েছে। আমরা এক গন্তব্যহীন ভবিষ্যতের হোঁচট খেতে খেতে চলছি। এই উম্মাহর কোনো ভবিষ্যত নেই।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণের অন্যতম উপায় হল, উম্মাহর সোনালী অতীতকে ভালোভাবে জানা। আমাদের কারো কারো মধ্যে ইসলামের ইতিহাস নিয়ে হীনমন্যতা কাজ করে। না জানা বা ভুল জানার কারণে, ইসলামি ইতিহাসের কোনো কোনো অংশকে লজ্জাজনক অধ্যায় মনে করে, নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে।

আমাদের অতীত নিয়ে লজ্জা পাওয়ার মতো কিছু নেই। আমাদের ইতিহাস অত্যন্ত শক্তিশালী ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ইতিহাস চর্চার জন্য মুসলিম চিন্তাবিদগণ একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের আবিষ্কার করেছেন-ইলমুল ইসনাদ। বিশ্বতিহাসে এমন অভিনব শাস্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না।

ইলমুল ইসনাদ

ইলমুল ইসনাদ (علم الإسناد) হলো ইসলামী জ্ঞানের এমন একটি শাখা, যাতে কোনো বর্ণনা, হাদীস, খবর বা ঐতিহাসিক তথ্য কার মাধ্যমে কার কাছে পৌঁছেছে—সেই বর্ণনাশৃঙ্খল যাচাই করা হয়।

"ইসনাদ" শব্দের অর্থ হলো:

কোনো বক্তব্যকে তার মূল বক্তার দিকে সম্পৃক্ত করা।

একজন রাবী (বর্ণনাকারী) কার কাছ থেকে শুনেছেন, তিনি আবার কার কাছ থেকে শুনেছেন—এভাবে ধারাবাহিকভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বা মূল ঘটনার উৎস পর্যন্ত পৌঁছানো।

উদাহরণ: ইমাম বুখারী বলেছেন → তিনি অমুকের কাছ থেকে শুনেছেন → তিনি তমুকের কাছ থেকে শুনেছেন → তিনি অমুক সাহাবীর কাছ থেকে শুনেছেন → রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন।

এই পুরো শৃঙ্খলটিই হলো "ইসনাদ"।

ইলমুল ইসনাদের উদ্দেশ্য-

কোন বর্ণনা সত্য আর কোনটি দুর্বল তা নির্ণয় করা, মিথ্যা বা জাল বর্ণনা শনাক্ত করা, বর্ণনাকারীদের চরিত্র, স্মৃতিশক্তি ও বিশ্বস্ততা যাচাই করা, দ্বীনের জ্ঞানকে বিকৃতি থেকে সংরক্ষণ করা।

ইসলামী সভ্যতায় এর গুরুত্ব

মুহাদ্দিসগণ (হাদীসবিশারদরা) প্রায় ৫ লক্ষ বর্ণনাকারীর জীবনী সংরক্ষণ করেছেন। কে কবে জন্মেছেন, কার কাছে পড়েছেন, তিনি সত্যবাদী ছিলেন কি না, স্মৃতিশক্তি কেমন ছিল—এসব বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেছিলেন:

الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء

ইসনাদ দ্বীনের অংশ। ইসনাদ না থাকলে যে যা ইচ্ছা বলত

সহজভাবে বললে,

ইলমুল ইসনাদ হলো ইসলামী জ্ঞানের "সূত্র যাচাই পদ্ধতি"। ইসলামী ইসনাদ পদ্ধতি শুধু সূত্রের নাম উল্লেখ করেই থেমে যায়নি; বরং সেই সূত্রবাহকদের জীবনও বিশ্লেষণ করেছে।

জ্ঞানের অনেক শাখা-প্রশাখা আছে। সব জ্ঞান উপকারী নয়। আমাদের নবী ﷺ আমাদের শিখিয়েছেন 'অকল্যাণকর জ্ঞান' থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে আমলের জন্য। এজন্য যা শিখছি, সেটা উপকারী হওয়া উচিত। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের ইতিহাস চর্চাকে উপকারী জ্ঞানচর্চার অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

— আল্লাহুম্মা আমীন।

ইতিহাস আমাদের জীবনের অংশ। ইতিহাস আমাদের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ছাত্রজীবন থেকেই স্বপ্ন দেখতাম, নিজে শাসক হতে পারলে আইয়ুবি রাজবংশের সুলতানদের লকব গ্রহণ করব। আল্লাহ তাআলা একাধিক পুত্র সন্তান দান করলে, সুলতানদের নামের সাথে মিলিয়ে নাম রাখব। বুয়াইহি (৯৩৪-১০৬২) রাজবংশের শাসকদের উপাধি ছিল 'দাওলাহ' দিয়ে। যেমন রুকনুদ্-দাওলাহ, আদুদুদ্-দাওলাহ, ফখরুদ্-দাওলাহ, বাহাউদ্-দাওলাহ। তারা ছিল ইমামি শিয়া। তাদের পর যখন সুন্নী আইয়ুবি রাজবংশ (১১৭১-১২৬০) ক্ষমতায় আসে, তাদের উপাধি ছিল দ্বীন। যেমন নাজমুদ্দীন, আসাদুদ্দীন, সালাহুদ্দীন। পরবর্তীতে মামলুক রাজবংশ (১২৫০-১৫১৭) ও অন্যান্য রাজবংশেও এই ধারা চালু ছিল। নিঃসন্দেহে সেটি ছিল সম্মান, শক্তি ও জিহাদের যুগ। নামগুলোর প্রতি ভালোবাসা সেই যুগ থেকেই পেয়েছি।

প্রথম প্রশ্ন: আমাদের চোখের সামনেই যখন বাস্তবতা বিকৃত করা হচ্ছে, তখন ইতিহাসকে কীভাবে বিশ্বাস করব?

প্রশ্নটাকে ঘুরিয়েও করা যায়: ইতিহাসের দরকারটাই বা কী, আর ঐতিহাসিকদেরই বা কী প্রয়োজন?

প্রায়ই এ ধরনের প্রশ্ন সামনে আসে। এটা শুধু সাধারণ মানুষের প্রশ্ন নয়; কিছু একাডেমিক ধারাও এই প্রশ্নকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। বিখ্যাত দার্শনিক Karl Popper তাঁর The Poverty of Historicism গ্রন্থে ইতিহাসবাদকে সমালোচনা করেছেন।

বিখ্যাত দার্শনিক কার্ল পপার[১] ও তার ঘরানার চিন্তাবিদদের দাবি, ইতিহাস পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে তৈরি কিছু মিথ্যার সমষ্টি। আমরা টাইম মেশিনে চড়ে অতীতে ফিরে গিয়ে যাচাই করতে পারব না, বইপুস্তকে যা বলা হয়েছে তা আদৌ সত্য নাকি মিথ্যা। যেহেতু আমাদের কাছে আসা বর্ণনাগুলো মূল্যায়ন করার ক্ষমতা আমাদের নেই, অতীতের অজানা বিষয়গুলোর সত্যতা উদঘাটন করার সুযোগ নেই, তাই এই পুরো ইতিহাসের আসলে কোনো মূল্যই নেই।

প্রথম দেখায় এই ধারণাটি যুক্তিসঙ্গত ও চিন্তার দাবি রাখে বলে মনে হতে পারে। বাস্তবে চিন্তাটা ভুল। এর জবাব আমরা একটি সহজ উদাহরণের মাধ্যমে দিতে পারি। আপনি যদি কোনো চাকরিতে আবেদন করতে যান, তাহলে প্রথমেই কী জমা দেন? সিভি বা জীবনবৃত্তান্ত। এই জীবনবৃত্তান্ত কী?
এটা আসলে ওই ক্ষেত্র বা পেশায় আপনার ইতিহাস। কোম্পানি আপনার সিভি বা অতীত অভিজ্ঞতা দেখে মূল্যায়ন করে, আপনি এই কাজের জন্য উপযুক্ত কি না।

---

[১] কার্ল পপার (১৯০২-১৯৯৪)। অস্ট্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছেন। দার্শনিক ও চিন্তাবিদ।বিজ্ঞানের দর্শন (Philosophy of Science) এবং রাজনৈতিক দর্শনের জন্য পরিচিত। পপার একটি প্রশ্ন নিয়ে কাজ করেছেন:
কোন জিনিসকে সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক বলা যাবে?

তিনি “Falsifiability” বা “খণ্ডনযোগ্যতা” ধারণার জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত।

Falsifiability কী?

কোনো তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক বলতে হলে সেটিকে ভুল প্রমাণ করার সুযোগ থাকতে হবে।

উদাহরণ: “সব মানুষ মরণশীল”। এই দাবিকে পরীক্ষা করা যায়, তাই এটি বৈজ্ঞানিক দাবি। কিন্তু এমন কোনো দাবি, যা কখনোই ভুল প্রমাণ করা সম্ভব নয়, সেটিকে তিনি প্রকৃত বিজ্ঞান মনে করতেন না।

ইতিহাস নিয়ে তাঁর ব্যতিক্রমী চিন্তা আছে। ইতিহাস নিয়ে প্রচলিত মত হল: ইতিহাসের নির্দিষ্ট ও অবশ্যম্ভাবী নিয়ম আছে। অতীত ইতিহাসের আলোকে ভবিষ্যৎ নিশ্চিতভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়।

পপার তার বিখ্যাত বই ‘The Poverty of Historicism’-তে উপরোক্ত ধারণার সমালোচনা করেছেন।তিনি মনে করতেন, মানবসমাজ খুব জটিল, জ্ঞানের পরিবর্তনের কারণে ভবিষ্যৎ পুরোপুরি পূর্বাভাস দেওয়া যায় না। তাই “ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবী গতি” ধরনের দাবিগুলো সন্দেহের সঙ্গে দেখা উচিত।

আরেকটি উদাহরণ: একজন সচেতন মানুষের সাথে স্মৃতিভ্রষ্ট (Amnesia) মানুষের পার্থক্য কী? মূল পার্থক্য একটাই, একজন তার অতীত মনে রাখতে পারে, অন্যজন পারে না। এখন বলুন তো, স্মৃতিভ্রষ্ট মানুষ কি নিজের জীবন সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে? তার নিজের জীবন ও দৈনন্দিন কাজকর্ম সামলানো কি স্বাভাবিক মানুষের মতো হয়? অবশ্যই নয়। দুইজনের মধ্যে বিশাল পার্থক্য আছে। ঠিক তেমনি মানুষের জীবনকাল খুবই সংক্ষিপ্ত। সাধারণত ৬০, ৭০, ৮০ বছর। খুব কম মানুষ ৯০ বা ১০০ বছরে পৌঁছায়। এই স্বল্প জীবন কোনো জাতির পূর্ণ ইতিহাস, কোনো সভ্যতার কাহিনি বা কোনো রাষ্ট্রের উত্থান-পতন পুরোপুরি ধারণ করতে পারে না। তাই যে ব্যক্তি বুঝতে চায়:

- রাষ্ট্র কীভাবে গড়ে ওঠে,
- কীভাবে ধ্বংস হয়,
- সভ্যতা কীভাবে জন্ম নেয়,
- কীভাবে পতন ঘটে,
- আমরা আজকের অবস্থায় কীভাবে এলাম,
- বর্তমান অবস্থা থেকে কীভাবে উত্তরণ ঘটাতে পারি?

তাকে অবশ্যই ইতিহাসের গভীরে যেতে হবে। তাকে দেখতে হবে পূর্ববর্তীরা কীভাবে জীবন কাটিয়েছে, কী রেখে গেছে, কী অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে—যাতে সে বর্তমান বাস্তবতাকে বুঝতে পারে এবং ভবিষ্যতের পথ নির্ধারণ করতে পারে। আমরা Al-Aqsa Flood operation প্রজন্মের মানুষ। আল্লাহ আমাদের গাজা ও সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ভাইদের সাহায্য করুন। এখন যদি কোনো তরুণ ফিলিস্তিন ইস্যু বুঝতে চায়, তাহলে সে কী করবে? প্রথম কাজই হবে—এর ইতিহাস জানা। সে বুঝতে চাইবে:

- কীভাবে এই পরিস্থিতি তৈরি হলো?
- কেন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে ইহুদিরা এসে এই ভূখণ্ডে জড়ো হলো?
- কেন এই জনগণ তাদের উপস্থিতি মেনে নিচ্ছে না?
- কেন সহাবস্থান সম্ভব হচ্ছে না?

এসব বুঝতে ইতিহাসে ফিরে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় কী? ধরা যাক, দুজন মানুষকে একই সমস্যা সমাধান করতে দেওয়া হলো—যেমন ফিলিস্তিন প্রশ্ন। একজনের ইতিহাসজ্ঞান নেই, অন্যজন ইতিহাস সম্পর্কে অভিজ্ঞ। যার ইতিহাসজ্ঞান নেই, সে হয়তো অনেক যুক্তিসঙ্গত সমাধান দেবে:

- এক রাষ্ট্র গঠন করা যেতে পারে। যার নাম হবে ‘ইসরাতীন’।
- স্থায়ী শান্তিচুক্তি,

- সহাবস্থান,
- এমনকি ফিলিস্তিনিদের সরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবও দিতে পারে, কারণ ইসরাইল শক্তিশালী।

মোটকথা সে বর্তমান সময়ের সংঘাতকে যেকোনো মূল্যে তাৎক্ষণিকভাবে শেষ করার জন্য জোড়াতালিযুক্ত কিছু সমাধান দিয়ে দিবে।

পক্ষান্তরে, যার ইতিহাস জ্ঞান রয়েছে, তার কাছে অতীতে চেষ্টা করা ও প্রস্তাব করা বিভিন্ন সমাধানের একটা বিশাল ভাণ্ডার বা অভিজ্ঞতা থাকবে। সে জানবে অতীতে কোন সমাধান কেন ব্যর্থ হয়েছিল এবং সফল সমাধানগুলো কেন সফল হয়েছিল। ফলে, যার কোনো ঐতিহাসিক স্মৃতি নেই তার দেওয়া অজস্র সমাধানের ভিড়ে, ইতিহাস জানা ব্যক্তিটি কেবল সেই একটি, দুটি বা তিনটি সমাধান বেছে নিতে পারবেন যেগুলোর ঐতিহাসিক নজির রয়েছে এবং যেগুলো অতীতে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

ইতিহাসের উপকারিতা সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট হয়, যখন আমরা দেখি অনেক ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎ অনুমান করার এক অসাধারণ ক্ষমতা ও অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। ইবনে খালদুনের (১৩৩২-১৪০৬) কথাই ধরা যাক। ইবনে খালদুন তাঁর মৃত্যুর ১০০ বছর পর ঘটবে এমন দুটি বড় ঘটনার নিখুঁত অনুমান করেছিলেন! ভাবা যায়? এটা হলো ইতিহাসকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার এবং ইতিহাসের অন্তর্নিহিত নিয়ম বা 'সুনান' (আসমানি নিয়মাবলী) উদঘাটন ক্ষমতার মোক্ষম প্রমাণ।

তিনি আন্দালুস (মুসলিম স্পেন) পতনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যা তাঁর মৃত্যুর ১০০ বছর পর বাস্তবে ঘটেছিল। তিনি বলেছিলেন, আপনি যখন আন্দালুসে যাবেন এবং দেখবেন সেখানকার মুসলমানরা তাদের আচার-আচরণে, রীতিনীতিতে এবং নিজেদের ঘরবাড়িতে ছবি টাঙানোর ক্ষেত্রে স্প্যানিশ ও ক্যাস্টিলিয়ান (খ্রিস্টানদের) অন্ধ অনুকরণ করছে, তখন বুঝবেন এটি তাদের সাংস্কৃতিক পরাজয়ের লক্ষণ, যার অনিবার্য পরিণতিতে সামরিক পরাজয় আসবে। তিনি তাঁর বিখ্যাত 'মুকাদ্দিমা'য় একটি অধ্যায়ই রচনা করেছেন যার শিরোনাম:

فصل في أن المغلوب مولَعٌ بالاقتداء بالغالب في زِيّه ونِحلَتِه وشِعاره وسائر عَوائده

পরাজিত জাতি সবসময় পোশাক, আদর্শ, প্রতীক ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিজয়ী জাতির অন্ধ অনুকরণে মত্ত থাকে। এই অধ্যায়ে তিনি উল্লেখ করেছেন, যারা এই বিষয়টিকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করবেন, তারা বুঝতে পারবেন, এটি মূলত সামরিকভাবে পরাজিত হওয়ার পূর্বলক্ষণ। অর্থাৎ তারা মানসিকভাবে বা সাংস্কৃতিকভাবে পরাজিত হওয়ার পর অচিরেই সামরিকভাবে পরাজিত হবে।

প্রখর ঐতিহাসিক স্মৃতি ও চেতনা না থাকলে, সাংস্কৃতিক পরাজয় যে অনিবার্য সামরিক পরাজয়ের দিকে নিয়ে যায়, ইবনে খালদুন কখনই অনুধাবন করতে পারতেন না।

আরেকটি উদাহরণ:

আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক: বিখ্যাত মুহাদ্দিস, 'ফাতহুল বারী'র লেখক ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানী (১৩৭২-১৪৪৯) ছিলেন ইবনে খালদুনের অন্যতম ছাত্র। তিনি বলেছেন: *আমি ইবনে খালদুনকে বহুবার বলতে শুনেছি যে—উসমানীয় বংশ (বনু উসমান) ছাড়া মিসরের সালতানাতের জন্য অন্য কোনো বড় বিপদ নেই।* অর্থাৎ সেই সময়ে মিসরে বিদ্যমান বিশাল ও শক্তিশালী মামলুক সালতানাত সম্পর্কে ইবনে খালদুন বলেছিলেন যে, এই সাম্রাজ্যের পতন কেবল উসমানীয়দের হাতেই ঘটবে। আর ঠিক তা-ই ঘটেছিল, তবে ইবনে খালদুনের মৃত্যুর ১০০ বছরেরও বেশি সময় পর। এমনকি ইমাম ইবনে হাজারও উসমানীয়দের মিসর বিজয়ের আগেই ইন্তেকাল করেছিলেন। একজন ঐতিহাসিকের ভবিষ্যৎ অনুমান করার এই ক্ষমতাই প্রমাণ করে, ইতিহাস পাঠের উপকারিতা কতটা ব্যাপক।

মানুষের জীবন সংক্ষিপ্ত। ইতিহাসের বড় বড় ঘটনা ও পরিবর্তনগুলো ধারণ করা ও বোঝা এই স্বল্প আয়ুর পরিধিতে সম্ভব নয়। অল্প সময়ে বেশি লাভ অর্জনের জন্য মানুষকে অবশ্যই ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে। ইতিহাস ও গল্পের প্রতি মানুষের এই টান একদম সহজাত। একটি শিশু যখন একদম ছোট থাকে, তখন মা তাকে গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়ান—আলী বাবা আর চল্লিশ চোরের গল্প শোনান। গল্পের প্রতি মানুষের এই মোহ তার স্বভাবের মধ্যেই গেঁথে দেওয়া হয়েছে; ফলে সে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্বের কচকচানি শেখার আগেই গল্পের সাথে পরিচিত হয়। কারণ গল্পই হলো সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও শক্তিশালী মাধ্যম।

সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্নটির উদ্রেক হলেও, মুসলমানদের আসলে এই প্রশ্নটি করাই উচিত নয় 'ইতিহাসের গুরুত্ব কী?' পবিত্র কুরআনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই ইতিহাস ও পূর্ববর্তীদের কিসসা বা কাহিনী।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে আল-আসির (১১৬০-১২৩৩) এ বিষয়ে চমৎকার একটি কথা বলেছেন। পবিত্র কুরআনে যে গল্পগুলো এসেছে এবং যা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে, তা কি কখনো অর্থহীন বা ফায়দাহীন হতে পারে? কখনই নয়! তাই একজন মুসলমানের মনে ইতিহাসের গুরুত্ব নিয়ে কোনো সংশয় থাকতেই পারে না, কারণ ইতিহাস কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের প্রতিনিধিত্ব করে। *কুরআনে এই গল্পগুলো নিয়ে আসার মূল প্রজ্ঞা বা উদ্দেশ্য হলো তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা,*

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

এতে অবশ্যই উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার হৃদয় আছে অথবা যে একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করে।" (সূরা কাফ: ৩৭)

যারা মনে করে, কুরআনের কাহিনীগুলো কেবলই গল্প বা অলস সময়ের বিনোদন লাভের জন্য বর্ণিত হয়েছে, তারা মূলত বোকার স্বর্গে বাস করছে। তারা কাফেরদের সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করছে যারা বলেছিল,

وَقَالُوٓا۟ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

আর তারা বলে: এগুলো তো আগের লোকদের কল্পকাহিনি, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; এরপর তা সকাল-সন্ধ্যা তার সামনে পাঠ করা হয় (ফুরকান: ৫)।

ইবরত: যে গল্পের কোনো উদ্দেশ্য বা উপকারিতা নেই, তাকেই মূলত 'উপকথা' বা 'অসার রূপকথা' বলা হয়। কুরআনের গল্পগুলোর মহান উদ্দেশ্য রয়েছে। এগুলো অত্যন্ত উপকারী। আল্লাহ তায়ালা এগুলো বর্ণনা করেছেন যাতে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে, সঠিক পথ খুঁজে পায়। সুতরাং যখন আপনি দেখবেন কুরআনের এক-তৃতীয়াংশই ইতিহাস, তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে মানুষের গঠন ও রাষ্ট্রের গঠনে ইতিহাস কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও জীবন্ত একটি বিষয়।
প্রাচ্যবিদ উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ[২] (Wilfred Cantwell Smith) বলেছিলেন, *"ইতিহাসের প্রতি মুসলমানদের অনুভূতি বা সচেতনতা পৃথিবীর যেকোনো জাতির চেয়ে বেশি তীব্র। তাদের ধর্ম ঐতিহাসিক চেতনা বিকাশমূলক উপাদানে ভরপুর।* বৌদ্ধ বা হিন্দুদের কাছে ইতিহাসের তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। খ্রিস্টানদের অবস্থাও তাই। একজন খ্রিস্টান তার ধর্ম থেকে শেখে, এই পৃথিবীটা কলুষিত বা ক্ষণস্থায়ী, আর প্রকৃত রাজ্য হলো আসমানী রাজ্য (Kingdom of Heaven)। একজন খ্রিস্টান ইতিহাসের চাকার সামনে হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যাতে চাকাটি তাকে পিষে চলে যায়, যা তার কাছে ক্রুশবিদ্ধকরণ ও আত্মত্যাগেরই পুনরাবৃত্তি।

একজন মুসলমান ইতিহাসের গতিকে নিষ্ক্রিয়ভাবে মেনে নেয় না; সে ইতিহাসের ধারাকে প্রতিরোধ করে, ইতিহাসের চাকাকে নিজের দিকে বা সত্যের পক্ষে ঘোরানোর চেষ্টা করে, যাতে পৃথিবীতে আল্লাহর ইচ্ছা ও

---

[২] **উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ (১৯১৬-২০০০)।** কানাডীয় ধর্মতত্ত্ববিদ, ইসলাম ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের গবেষক, ২০শ শতকের অন্যতম প্রভাবশালী ধর্মচিন্তাবিদ তিনি 'ধর্ম (Religion)'-র ধারণার আধুনিক ব্যাখ্যা নিয়ে সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। **তাঁর ধারণা মতে,** Religion বা ধর্ম কোনো স্থির বস্তু নয়, বরং মানুষের বিশ্বাস ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার একটি চলমান প্রক্রিয়া। তিনি ইসলাম নিয়ে তুলনামূলকভাবে সহানুভূতিশীল ও বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মুসলিম সমাজ ইতিহাসচেতনায় বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। তার গবেষণা আধুনিক ধর্মতত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে, ইসলাম ও পশ্চিমা একাডেমিক স্টাডিজে নতুন আলোচনার পথ খুলে দিয়েছে।

বিধান বাস্তবায়িত হয়। এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে একজন মুসলিম মূলত পরকালের মুক্তি ও পুরস্কার অনুসন্ধান করে।

এট একজন অমুসলিম প্রাচ্যবিদের বক্তব্য।

ফরাসি প্রাচ্যবিদদের লেখা 'বিশ্বের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস' বইটিতে বলা হয়েছে,"ইসলাম যতটা না শহীদদের ধর্ম, তার চেয়ে বেশি বীরদের ধর্ম"। এখানে 'বীরদের ধর্ম' বলতে বোঝানো হয়েছে, ইসলাম জীবন ও সমাজকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করে। খ্রিস্টীয় ধারণার মতো ইসলাম হাত গুটিয়ে নিষ্ক্রিয় থেকে বা আত্মসমর্পণ করে 'শহীদ' হতে বলে না; লড়াই করতে বলে।

আচ্ছা, ইবনে খালদুন যেভাবে ইতিহাসের দুটি বড় ঘটনার নিখুঁত অনুমান করেছিলেন, আজ কি এমন কেউ আছেন যিনি আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে আগামী কয়েক বছর পর কী ঘটতে যাচ্ছে তা অনুমান করতে পারেন? আমি ১০০ বছর পরের কথা বলছি না, অন্তত আগামী কয়েক বছরের কথা। যুবসমাজের বড় একটি অংশ এখন চরম দিশেহারা ও বিভ্রান্ত, আসলে সামনে কী হতে যাচ্ছে!

উম্মাহর মধ্যে এমন দূরদৃষ্টি ও ভবিষ্যৎ অনুমানের ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ সবসময়ই থাকেন। উম্মাহ কখনোই তাদের থেকে শূন্য হয় না। শেখ হাযেম সালাহ আবু ইসমাইলের (আল্লাহ তাঁর মুক্তি ত্বরান্বিত করুন) কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারি। মিসরে সামরিক অভ্যুত্থানের পরই মানুষ মূলত শেখ হাজেমের আসল মূল্য বুঝতে পেরেছে। এই তো কয়েকদিন আগেও তাঁর একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। অভ্যুত্থানের পর থেকে মানুষ প্রতিনিয়ত তাঁর পুরোনো ভিডিওগুলো শেয়ার করছে। তিনি আজ যা ঘটছে—এমনকি লোহিত সাগরের দ্বীপ দুটি (তিরান ও সানাফি দ্বীপ) হাতছাড়া হওয়ার বিষয়সহ বহু কিছুর নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ার একজন তরুণ চমৎকার একটা কথা লিখেছে: "ভাই, এমন কোনো ঘটনা কি ঘটবে না যার ওপর শেখ হাজেম আবু ইসমাইলের কোনো পুরোনো ভিডিও খুঁজে পাওয়া যাবে না?" অর্থাৎ যা-ই ঘটছে, দেখা যাচ্ছে তিনি আগেই সে বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন।

আমরা এখন একটি মজলুম ও দুর্বল জাতি। বর্তমানে মিডিয়া বা একাডেমিক অঙ্গনে যে বুদ্ধিজীবী বা প্রথম সারির এলিটদের দেখা যায়, তারা কিন্তু উম্মাহর নিজস্ব পছন্দে উঠে আসেনি। তারা একশ্রেণীর 'কৃত্রিম এলিট', যাদেরকে পুঁজিপতি ও প্রভাবশালীরা তৈরি করেছে। এই পুঁজিপতিরা আবার রাজনৈতিক ক্ষমতার ছত্রছায়ায় থাকে। ফলে তারা (শাসক ও পুঁজিপতিরা) যাকে ইচ্ছা নিচে নামিয়ে দেয় আর যাকে ইচ্ছা সমাজ ও মিডিয়ার চূড়ায় বসিয়ে দেয়। এ কারণেই সাংস্কৃতিক ও গণমাধ্যমের উপরিভাগে কেবল তাদেরই দেখা যায়, যারা অর্থ ও রাজনৈতিক ক্ষমতার মালিকদের অনুগত। এমনকি সেই ব্যক্তিটি যদি নিরেট মূর্খ বা অযোগ্যও হয়, তবুও

তাকেই সামনে আনা হয়। এ বিষয়ে আমাদের প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বহু আগেই সতর্ক করে গেছেন। তিনি বলেছেন:

إنَّها ستَأتي على الناسِ سُنونٌ خَدَّاعَةٌ يُصَدَّقُ فيها الكاذِبُ ويُكَذَّبُ فيها الصادِقُ ويؤتَمَنُ فيها الخائِنُ ويُخَوَّنُ فيها الأمينُ ويَنطِقُ فيها الرُّوَيبِضَةُ قيل وما الرُّوَيبِضَةُ قال السَّفِيهُ يتكَلَّمُ في أمرِ العامَّةِ

> *মানুষের ওপর এমন একটি প্রতারণাপূর্ণ সময় আসবে, যখন মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী বলা হবে আর সত্যবাদীকে বলা হবে মিথ্যাবাদী; খিয়ানতকারীকে আমানতদার বানানো হবে আর আমানতদারকে বলা হবে খিয়ানতকারী। আর সে সময় 'রুওয়াইবিদ্বাহ' (الرويبضة) কথা বলবে।" সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! রুওয়াইবিদ্বাহ কী?" তিনি বললেন, "অতি নগণ্য ও মূর্খ ব্যক্তি, যে সমাজের সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্তমূলক কথা বলবে (মুসনাদ)।*

বাস্তবিক অর্থেই আমরা এখন সেই রুওয়াইবিদ্বার যুগে বাস করছি। একটা কথা মনে রাখব, একজন মুসলমান হিসেবে আমরা ভবিষ্যৎ অনুমান বা ভবিষ্যদ্বাণী করার চেয়ে 'নিজের দায়িত্ব ও আমল' করার জন্য আল্লাহর কাছে বেশি দায়বদ্ধ। কিয়ামতের দিন আমাদের প্রত্যেককে এককভাবে হিসাব দিতে হবে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فَرْدًا

> *এবং কিয়ামতের দিন তাদের প্রত্যেকেই তাঁর কাছে একাকী উপস্থিত হবে* (মারয়াম: ৯৫)।

একজন মুসলমানের কর্তব্য হল, ইসলামের মর্যাদা ও বিজয়ের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। এটা এ জন্য নয় যে, ইসলামের তাকে প্রয়োজন, বরং এই কারণে যে, আল্লাহর দরবারে নিজের নাজাত বা মুক্তির জন্য তার নিজেরই এই আমলটুকু প্রয়োজন। ইসলামের ইতিহাসের এমন যুগও গেছে যখন ইসলাম ছিল বিজয়ী ও শক্তিশালী, অথচ সে সময়েও অনেক মানুষ (নিজেদের আমলহীনতার কারণে) জাহান্নামে গেছে। আবার এমন যুগও গেছে যখন ইসলাম ছিল চরম নির্যাতিত ও দুর্বল, অথচ সেই কঠিন সময়েও ঈমানের ওপর টিকে থেকে মানুষ জান্নাতি হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের কাছে এটিও প্রকাশ করে দিয়েছেন, পৃথিবীতে মুসলমানদের খেলাফত বা পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পরেও কিছু মানুষ কুফরিতে লিপ্ত হয়ে জাহান্নামে গিয়েছে,

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ
ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ
أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْـًٔا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব (খেলাফত) দান করবেন, যেমন তিনি দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদের শান্তি ও নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবে না। এর পরেও যারা কুফরি করবে, তারাই তো পাপাচারী (নুর: ৫৫)।

ইবরত: সবকিছু ঠিকঠাক। আয়াতের শেষে কী বললেন? আল্লাহ তাআলা এতকিছু করার পরও যারা কুফরি করবে, তারা পাপী। তার মানে, কিছু লোক সবকিছু পাওয়ার পরও কুফরি করবেই। একজন মুসলমানের দায়িত্ব হল, ভবিষ্যত জীবন কেমন হবে, সেই চিন্তায় থমকে থাকার চেয়েও এই মুহূর্তে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য কী, সেটাকে বেশি গুরত্ব দেয়া।

বর্তমান 'তুফান আল-আকসা'র মতো কোনো পরিস্থিতির কথা বলি, কিংবা অতীতের ১৯৪৮ সালের 'নাকবা' বা মহা-বিপর্যয়ের কথাই ধরি, এমন সঙ্গিন পরিস্থিতিতে একজন সাধারণ মুসলমানের মূল দায়িত্ব হল, সাধ্যমতো লড়াই করা, জিহাদ করা। এমনকি বাহ্যিক হিসাব-নিকাশ বা ভবিষ্যৎ বিশ্লেষণ যদি একথা নিশ্চিত করে বলত যে, এই যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত, তবুও তাকে লড়ে যেতে হতো। ইতিহাস তৈরি করার দায়িত্ব আল্লাহ আমাকে দেননি, আল্লাহ আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন এই মুহূর্তে আমার ওপর অর্পিত কর্তব্যটুকু পালন করার। নিজের বর্তমান দায়িত্ব পালন করার সাথে ভবিষ্যৎ অনুমানের সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। হ্যাঁ, অতীতের আলোকে যে ভবিষ্যৎ অনুমান আমাদের পরিকল্পনা করতে, যুদ্ধের কৌশল সাজাতে, সাময়িক পিছু হটতে, বা নিজেদের শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে—সেটি অবশ্যই প্রয়োজনীয়। তবে, মূল বিষয় হলো আপন কর্তব্য সম্পাদন করে যাওয়া। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

من قُتِلَ دونَ مالِه فهو شهيدٌ، ومن قُتِلَ دونَ دمِه فهو شهيدٌ، ومن قتل دونَ دينِه فهو شهيدٌ، ومن قُتِلَ دونَ أهلِه فهو شهيدٌ

যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ, যে নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ (তরগীব)।

একজন মুসলমানের মূল লক্ষ্যই হলো নিজের দায়িত্বটুকু পালন করে যাওয়া। তাতে দুনিয়াবি বিজয় আসুক বা তার ভাগ্যে শাহাদাত জুটুক, কোনো অবস্থাতেই বর্তমানে কর্তব্যে অবহেলা করা যাবে না। পাশাপাশি একথাও মনে রাখতে হবে, উম্মাহর সমষ্টিগত স্বার্থে এমন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষদের সবসময় প্রয়োজন আছে, যারা ইতিহাস পড়েছেন, বর্তমানকে বোঝেন এবং যাদেরকে আল্লাহ ভবিষ্যতের গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছেন। এই মানুষগুলোই উম্মাহর জন্য সঠিক কৌশল নির্ধারণ করতে পারেন, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করতে পারেন এবং উম্মাহকে সঠিক পরামর্শ দিতে পারেন।

তাহলে আমরা বলতে পারি, ইতিহাস আমাদের বলে, আমরা কীভাবে আজকের এই অবস্থানে এসে পৌঁছলাম, কীভাবে আমরা সামনে এগিয়ে যাব, কীভাবে আমরা ভবিষ্যৎকে অনুধাবন করব। সুতরাং, 'ইতিহাসের কোনো প্রয়োজন নেই', এই যে একটা ভাঙা রেকর্ড বা অসার রব বাজারে চালু আছে, তার ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে। আমরা ইতিহাসের সাথে মিলেমিশে বাঁচব, তা থেকে উপকৃত হব।

কথাটা আরেকভাবেও বলা যায়। ইতিহাস পড়ার আসল ফায়দা হলো, আল্লাহর 'সুনান' বা অপরিবর্তনীয় নিয়মগুলোকে বোঝা, অতীতে কী ঘটেছিল তা জানা, তা থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা, বর্তমান সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়া। ইতিহাস থেকে আমরা মূলত দুটি বড় উপকার পাই:

ক. আল্লাহর সুনান (নিয়মাবলী) অনুধাবন করা।

খ. সেই অনুযায়ী আমল করা।

অর্থাৎ ইতিহাসের নিয়মগুলো বোঝা এবং বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ করা।

মাদরাসারাসাতুল কুরআনিল কারীম

০১৫৫২৭৩৮৫৬২

বাড্ডা, ঢাকা।